দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 31 DEC 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৪ ...

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

দরকার সমন্বিত নীতিমালা

আবদাল আহমদ ঃ অকার্যকর ও বিশৃংখল শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে একটি সমন্বিত নীমিমালা প্রয়োজন। এ অভিমত সংশ্লিষ্ট সকল মহলের। শিক্ষাসংক্রান্ত ধারাবাহিক রিপোর্ট 'শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা' করতে গিয়ে তাই মনে হয়েছে। সরকার পয়লা জানুয়ারী থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করছেন। এর সাফল্য নির্ভর করবে একটি সমন্বিত নীতিমালার উপর।

স্বাধীনতার ২০ বছর পরও আমাদের শিক্ষিতের হার ২৫ শতাংশের উপরে ওঠেনি। পুরো বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। বহু দরিদ্র দেশও তাদের শিক্ষিতের হার ৯০ শতাংশের উপরে এনেছে। শ্রীলংকায় শিক্ষিতের হার প্রায় ১০০ শতাংশ। পাশের দেশ ভারত ও পাকিস্তানের শিক্ষিতের হারও আমাদের (শেষ পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

দরকার সমন্বিত নীতিমালা

চেয়ে অনেক বেশী। তাহলে আমরা কেন পারব না? আমাদেরকে অবশ্যই পারতে হবে। আর তা সম্ভব এখনই। কারণ দেশে এখন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম রয়েছে।

'শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা' শীর্ষক রিপোর্টের ২০টি পর্বে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলি তুলে ধরেছি। এ ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আমরা শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, অভিভবাক এবং বিশেষজ্ঞ মহলের সঙ্গে আলাপ করেছি। এ ব্যাপারে তাদের দেয়া সুপারিশগুলোই তুলে ধরা হল ঃ

শিক্ষা জালিয়াতি প্রতিষ্ঠান–গুলো বন্ধ করা হোক

শিক্ষা দেয়ার নামে ব্যবসা হিসাবে যেসব কোচিং সেন্টার, টিউটরিয়াল হোম, স্পোকেন ইংলিশ কোর্স, স্টুডেন্টস গাইড, এডুকেশনাল কন্সালটেন্টস, ফরেন কন্সালটেন্টস ইত্যাদি গজিয়েছে সেগুলো অবিলম্বে আইন করে বন্ধ করে দেয়া হোক। ব্যাঙের ছাতার মত দেশে এগুলো গজিয়ে ওঠা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্যদশাই তুলে ধরছে। শিক্ষাদানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই এগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবকদের মাঝে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব জালিয়াতি ঘটছে এ সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠান জড়িত। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেসব জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে তার মধ্যে রয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষকদের কাছ থেকে কৌশলে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও সাজেশনের নামে প্রশ্ন বের করে আনা, কোন কোন শিক্ষককে দুর্নীতিপরায়ণ হতে সহায়তা করা, স্কুল–কলেজ ও বোর্ডের ফলাফলে হস্তক্ষেপ, নোট ব্যবসা, খরচাপাতির নামে ঘুষ প্রথা চালু ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকার কারণে ছাত্ররা ক্লাসের ব্যাপারে তেমন সিরিয়াস নয়। ঐসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে কোর্স কভার করে নেবে এইভেবে ছাত্ররা ক্লাসে অমনোযোগী থাকে। তাছাড়া শিক্ষকরাও ক্লাসে দায়সারা গোছের করে পড়ান। কারণ, অনেক শিক্ষককে মোটা অংকের ফি–এর মাধ্যমে ঐসব প্রতিষ্ঠানে কন্সালট্যান্ট হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

কিন্ডার গার্টের শিক্ষার উপর নীতিমালা

সরকারী শিক্ষাপদ্ধতির পাশাপাশি বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে কিন্ডার গার্টেন চালু রাখতে হলে কতগুলো ব্যবস্থা নেয়া দরকার। প্রথমই দরকার কিন্ডার গার্টেনের উপর সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য বই বিষয়ে যেসব নীতিমালা দরকার তা হচ্ছে ঃ সরকারী শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম ও সিলেবাস) অনুসরণ করতে হবে, এই সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত দেশী পাঠ্যবই পড়াতে হবে। উপযুক্ত বই না থাকলে এ বিষয়ে ভাল বই লেখার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যে লেখকের বই ভাল হবে সেটিই চালু করা যেতে পারে। কিন্ডার গার্টেনে বিদেশী বই ব্যবহার করা যাবে না। বইয়ে জাতীয় ভাবধারার পরিপন্থী কোন কিছু থাকতে পারবে না। প্রতিটি শ্রেণীর মান ও প্রয়োজন অনুযায়ী বইয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। অহেতুক বইয়ের ভার শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

কিন্ডার গার্টেনের জন্য বেসকারী ...স্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত যেসব পদক্ষেপ ...তে হবে ঃ এক, প্রকাশিত বইয়ের ...র্বক মান নির্ধারণের জন্য একটি জাতীয় ...য়ের কমিটি থাকবে। কমিটির অনু–...নের উপর বইটির স্কুলে অন্তর্ভুক্তি ... করবে। দুই ঃ অনুমোদন কমিটিতে ... বুক বোর্ড, শিক্ষা পরিদফতর, ... প্রতিনিধি, অভিভাবক প্রতিনিধি, ...বী অবশ্যই থাকতে হবে। তিন ঃ ...বুক বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটি ইতিপূর্বে তাড়াহুড়া করে এবং নামকাওয়াস্তে যেসব বই অনুমোদন করেছে তা বাতিল করতে হবে। চার ঃ শিক্ষা দেয়ার মাধ্যম হবে বাংলা। ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গুরুত্ব দিতেহবে।

কিন্ডার গার্টেন স্কুল ও শিক্ষার পরি–বেশ বিষয়ে যেসব ব্যবস্থা থাকা দরকার তা হচ্ছে স্কুলের আয়তন, পাঠকক্ষ, আস–বাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক সংখ্যা অবশ্যই ছাত্রদের সংখ্যার অনুপাতে থাকতে হবে, সর্বোপরি স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ থাকতে হবে। শিক্ষকদের পাঠদান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে, শিক্ষকতার জন্য সর্বনিম্ন ডিগ্রীর পর্যায় নির্ধারণ করতে হবে।

কিন্ডার গার্টেন স্কুল গঠন ও পরি–চালনার ব্যাপারে যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে তা হচ্ছেঃ এক, বেসকারীভাবে ও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে স্থাপিত কোন স্কুলে একটি পরিচালক মন্ডলী থাকতে হবে। এই মন্ডলী বা কমিটি স্কুলের তদারক করবে। কমিটিতে মহল্লার অভিভবাক প্রতিনিধি, শিক্ষক প্রতি–নিধি, সরকারী প্রতিনিধি থাকতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠানটি শুধুই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান না হয়। ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অর্থ উপর্জানের মাধ্যম হিসাবে স্কুল খোলা যাবে না। স্কুলের আয়–ব্যয় স্কুল কর্তৃপক্ষের থাকবে। প্রয়োজনে স্কুলের জন্য ট্রাস্ট গঠন করা যেতে পারে। স্কুলের শিক্ষকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো সর–কারীভাবে প্রণীত হতে হবে। শিক্ষকদের নিয়োগপত্র দিতে হবে। সরকারীভাবে প্রণীত এই বিধি কিন্ডার গার্টেনগুলোকে মেনে চলতে হবে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণী অনুযায়ী টিউশন ফির (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন) অংক নির্ধারণ করতে হবে। এ ফি সরকারকে নির্ধারণ করে দেয়া দরকার।

বেসরকারী স্কুল সম্পর্কে

বেসরকারী স্কুলের জন্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি আলাদা উইং গঠন করতে হবে। তাদের কাজ হবে বেসরকারী স্কুলের একটি তালিকা প্রণয়ন, অনুসৃত পাঠ্যবই পরীক্ষা, স্কুল তদারকি ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা, শিক্ষা অফিসারদের এ সম্পর্কে ত্রৈমাসিক পরিদর্শন রিপোর্ট পেশ এবং এ রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কুল বন্ধ করে দেয়া কিংবা 'ওয়ার্নিং লেটার' ইস্যু করা। তাছাড়া বেসরকারী স্কুলগুলোকে সর–কারীভাবে রেজিস্ট্রিকরণের ব্যবস্থা। রেজি–স্ট্রেশন ছাড়া স্কুল খোলা যাবে না এ জন্য কতগুলো শর্ত পূরণও করতে হবে।

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার মান বাড়াতে হবে

শিক্ষার প্রাথমিক স্তর শিক্ষা পিরামিডের ভিত্তি। কিন্তু দেশের প্রাথমিক স্তর অবহেলিত। শিক্ষাদান পদ্ধতি খুবই দুর্বল। পড়ালেখা নিম্নমানের এবং অনা–কর্ষণীয়। প্রাইমারী স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং উদ্যোগী শিক্ষক অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ নেই, সুলিখিত ও চিত্তাকর্ষক বই নেই। বিনোদনের পরিবর্তে মফস্বল এলাকার অনেক প্রাইমারী স্কুলে রয়েছে সেকেলে আমলের নানা নিপীড়ন ও মারধোরের ঘটনা। ফলে অনেক ছাত্রের মধ্যে স্কুল ভীতির সৃষ্টি হচ্ছে। স্কুল তদারকিও কম। সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার এ সময়ে স্কুলগুলোর এসব সমস্যার দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান বাড়িয়ে এবং বিনোদনের পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। মারধোরের পরিবর্তে আদর–স্নেহের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যভ্যাস বৃদ্ধি এবং স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে।

মহানগরীতে মহল্লাভিত্তিক স্কুল দরকার

ঢাকা মহানগরীর মত বড় শহরে যাতায়াত ঝুঁকি, অধিক ব্যয়, সময়ের অপচয় ইত্যাদির কথা ভেবে মহল্লাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত এবং প্রতিষ্ঠা করা দরকার। অন্যান্য দেশে এ ধরনের মহল্লাভিত্তিক স্কুল রয়েছে। অভিভাবকরা স্কুলের সুবিধা দেখে সেসব দেশে মহল্লায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। মহল্লার মধ্যে স্কুল থাকলে অভিভাবকরা বাড়তি খরচ ও টেনশন থেকে রক্ষা পান।

তাই মহল্লাভিত্তিক স্কুল করে সেসব স্কুলে ঐ মহল্লার ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ করা দরকার। এসব মহল্লা ভিত্তিক স্কুলে যাতে ভাল পড়াশুনা হয় এবং স্কুলগুলো যাতে ভালবাবে চলে সে দায়িত্ব সরকারের সঙ্গে মহল্লাবাসীরও। মহল্লার মসজিদের প্রতি মহল্লাবাসীর যে ধরনের মমতাবোধ, স্কুলের উন্নয়নের ব্যাপারেও তা থাকাচাই।

ঢাকার সরকারী স্কুল সম্পর্কে

ঢাকা মহানগরীর ২৪টি সরকারী স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যাপারে তারতম্য কেন সে ব্যাপারে তদন্ত দরকার। দেখা যায় মাত্র ৪/৫টি স্কুলে ছাত্র ভর্তির জন্য প্রতি–যোগিতা হয়। বাকী স্কুলগুলোতে এ রকম চাপ নেই। অথচ ২৪টি স্কুলে একই সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে নির্ধারিত আসনে ছাত্র বাছাই করে মহল্লার ভিত্তিতে কে কোন স্কুলে পড়বে তা নির্ধারণ করা হলে এ সমস্যাটির সুরাহা হত।

মহানগরী ঢাকার মতিঝিল গভঃ বয়েজ হাই স্কুল ও খিলগাঁও গভঃ হাই স্কুল সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা না দেখেই ছাত্রছাত্রীদের মার্ক দেয়া, ভর্তির অনিয়ম ইত্যাদি। এগুলো তদন্ত করা দরকার।

প্রাইভেট টিউশন সম্পর্কে

দেশে প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, হঠাৎ করে তা তুলে দেয়া সম্ভব নয়। এ সমস্যাটির সমাধান তখনই হবে, যখন স্কুল–কলেজে শিক্ষাদান জোরদার হবে। স্কুল–কলেজে ভাল পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে পারলে দেশের শিক্ষা টিউশননির্ভর হবে না, নোটনির্ভর হবে না। তাই শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উপযোগী নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত। আপাতত জরুরী ভিত্তিতে যেটা করা উচিত তা হচ্ছে বোর্ডের পরীক্ষক, টেবুলেটর, প্রশ্নকর্তাদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করে দেয়া। আইন ভঙ্গ করলে কড়া পদক্ষেপ। তবে এসব পরীক্ষক, প্রশ্ন–কর্তাদের আলাদা সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করাদরকার।

শিক্ষার মূল্যায়ন বিষয়ে

পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার নানা কৌশল এখন শিক্ষার্থীদের জানা আছে। মূল পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত, ত্রুটিপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য সাহায্য পুস্তক ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রচনা ও বিক্রয় হয়। আজকাল টেস্ট পেপারস সাজেশনস ও গাইড বের হচ্ছে। প্রশ্নপত্রে বহুসংখ্যক প্রশ্নের মধ্যে মাত্র স্বল্পসংখ্যক প্রশ্ন বাছাই করা, আবশ্যিক এবং বাছাই করা প্রশ্নের উত্তর শিখে ও লিখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এখন বাধা নেই। ফলে নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষার্থীর যে জ্ঞান অর্জন করার কথা তা থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করে এবং সকল পরীক্ষার্থীদেরকে একই মানদন্ডে বিচারও করা হয় না। কখনও পরীক্ষার প্রশ্ন আগাম ফাঁস হয়ে যায়। বহিঃপরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে নানারকম কারচুপি চলে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমানে পরীক্ষা কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা বাধাধরা ছকে সকল শাখার ছাত্রকে মোট ৬০০, ৪৫০ ও ৩৩০ নম্বর দিয়ে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়। এটা ন্যায়বিচার নয়।

তাই এক, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষা সমন্বিত ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করা যেতে পারে। দুই, বিবরণমূলক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় পদ্ধতির পরীক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করা যেতে পারে। তিন, স্কুল পর্যায়ে প্রতি বছর মাত্র একটি বা দুটি পরীক্ষার উপর নির্ভর না করে কতগুলো ধারাবাহিক পরীক্ষার মিলিত ফলের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর অর্জিত সাফল্য বিচার করা যেতে পারে। প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ না দেখিয়ে গ্রেডেশন পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণদের প্রতিযোগি–তামূলক মান বিচারের জন্য বৃটেনের মত 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষার মত কোন পরীক্ষার প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা বিচার করা যেতে পারে।

বর্তমানে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মেধা তালিকা নিয়ে নানা অভিযোগ প্রতিবছর উঠছে। এ জন্যে বোর্ডের সবগুলো খাতা সাধারণ পরীক্ষণের পর যে ১০০টি খাতা উচ্চ নম্বর পাবে, সে খাতাগুলি তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হলে প্রকৃত মেধাবীরা বেরিয়ে আসবে।

ডিগ্রী কোর্স

বর্তমানে দেশে ডিগ্রী পর্যায়ে পাস কোর্স ও অনার্স কোর্স এ দুটি পদ্ধতি চালু আছে। এর মধ্যে অনার্স কোর্স তিন বছরের এবং পাস কোর্স দু'বছরের। বিশ্বের কোন দেশে এখন আর দু'বছরের পাস কোর্স নেই। সব জায়গায় এখন তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু রয়েছে। ফলাফলের উপর নির্ভর করে কাকে পাস ডিগ্রী কাকে অনার্স ডিগ্রী দেয়া হবে। তাই দেশে ডিগ্রী কোর্স তিন বছরের হিসাবে চালু করা যেতে পারে। যারা রেজাল্ট ভাল করবে তারা অনার্স পাবে।